স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

প্রসবজনিত ফিস্টুলা: একটি দুঃসহ ক্ষত

ফৌজিয়া আখতার হুদা
আইসিডিডিআর,বি

বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোতে প্রসবজনিত ফিস্টুলা (obstetric fistula) একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা, যেখানে বিপুলসংখ্যক মা কোনো চিকিৎসা সহায়তা ছাড়াই সন্তান প্রসব করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে 'অবহেলিত অবস্থায় সন্তান প্রসবের সবচেয়ে বিরূপ প্রভাব' বলে অভিহিত করেছে, যার শিকার হচ্ছেন বিশ্বের প্রায় ২০ লক্ষ মহিলা। এই সংখ্যা আরো বেশিও হতে পারে!

ফিস্টুলা কী

ফিস্টুলা হলো যোনি এবং মূত্রথলি অথবা যোনি এবং পায়ুপথের মধ্যবর্তী অংশে সৃষ্ট একটি অস্বাভাবিক ছিদ্র। যোনি ও মূত্রথলির মধ্যবর্তী জায়গায় এধরনের ছিদ্র সৃষ্টি হলে তাকে ভেসিকো-ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা এবং যোনি ও পায়ুপথের মধ্যে সৃষ্ট ছিদ্রকে রেক্টো-ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা বলা হয়ে থাকে। এজাতীয় সমস্যা হলে যোনির ভেতরে প্রস্রাব ও মল প্রবেশের পথ তৈরি হয় এবং এর ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে সবসময়ই প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়ায়।

দীর্ঘায়িত প্রসবের সময় শিশুর মাথার চাপে নরম টিস্যুগুলোর (ছবিতে লাল দাগের সাহায্যে দেখানো হয়েছে) সংকোচনের ফলে মূত্রথলি বা পায়ুপথে রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হয়। এভাবে এসব জায়গার টিস্যু স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে ফিস্টুলা সৃষ্টি হয়

ফিস্টুলায় আক্রান্ত একজন মহিলা নিজেকে সবসময় গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন

কীভাবে ফিস্টুলা হয়

কোনো প্রতিবন্ধকতার ফলে প্রসব দীর্ঘায়িত হলে প্রসূতি মা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে যেতে পারেন, এমনকি মায়ের মৃত্যুও হতে পারে। দীর্ঘায়িত প্রসব সারাবিশ্বের প্রায় পাঁচ লক্ষ মাতৃমৃত্যুর আট শতাংশের জন্য দায়ী। এ-অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা বা সিজারিয়ান ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ না-থাকলে মৃতশিশু প্রসব, নবজাতকের মৃত্যু অথবা মায়ের শারীরিক অক্ষমতা দেখা দিতে পারে বা মৃত্যুও হতে পারে। দীর্ঘায়িত প্রসবের সময় যখন প্রসূতি শিশুর জন্ম দিতে চেষ্টা করেন এবং শিশুর মাথা অনবরত মায়ের পেলভিক হাড়ে চাপ দিতে থাকে তখন যোনি ও মূত্রথলি বা যোনি ও পায়ুপথের মধ্যকার টিস্যুগুলো নষ্ট হয়ে গিয়ে ফিস্টুলার সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও, যেসব কারণে ফিস্টুলা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে যৌন-নিপীড়ন ও ধর্ষণ, শল্যচিকিৎসার ফলে সৃষ্ট ক্ষত, প্রজননতন্ত্রের ক্যান্সার ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট রেডিওথেরাপি এবং গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালীন জরুরী অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব অন্যতম।

ফিস্টুলার বিরূপ প্রভাবসমূহ

শারীরিক: দীর্ঘায়িত প্রসবের ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত শিশুর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম থাকে এবং প্রসূতি মা নিজে বেঁচে গেলেও তাঁর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় ও ফিস্টুলা দেখা দিতে পারে। ফিস্টুলার ফলে যোনিপথে মলমূত্র এসে সার্বক্ষণিক অস্বস্তির সৃষ্টি করে। অনেকসময় দীর্ঘায়িত প্রসবের ফলে 'ফুট ড্রপ'-নামক একধরনের শারীরিক অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। এরকম অবস্থায় কোনো মহিলার নিম্নাঙ্গের

ভেতরের পাতায়

- শব্দদূষণ: একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্যসমস্যা
- ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- বাংলাদেশে নিপাহ রোগ ও প্রতিরোধের উপায়
- কম খেলে ভালো থাকা যায়

বর্ষ ২০ | সংখ্যা ৩
চৈত্র ১৪১৮ | এপ্রিল ২০১২
ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮৪০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

স্নায়ুর ক্ষতির ফলে তিনি হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। ফিস্টুলা যৌনাঙ্গে আলসার বা ঘায়ের সৃষ্টি করতে পারে। সঠিকভাবে চিকিৎসা করা না-হলে আলসার এবং সংক্রমণের ফলে কিডনির রোগ হতে পারে এবং কিডনি বিকল হয়ে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

সামাজিক: শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি ফিস্টুলার কারণে আক্রান্ত মহিলাকে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফিস্টুলার জন্য একজন মহিলাকে তাঁর স্বামীর কাছে হেয় হতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটতে পারে। ফিস্টুলার ফলে সৃষ্ট দুর্গন্ধের কারণে আক্রান্ত মহিলাকে সবসময় লজ্জার মধ্যে থাকতে হয়। সবাই তাঁকে অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র বলে মনে করে এবং এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি সন্তান গ্রহণে অক্ষম হয়ে পড়েন। ফিস্টুলা আছে এমন মহিলাদেরকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অস্পৃশ্য জীবনযাপন করতে হয়। তাঁরা বিষণ্নতায় ভোগেন এবং তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এধরনের মহিলাদের মধ্যে অনেকসময় আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যায়। সমাজবহির্ভূত হয়ে এবং কাজের সুযোগ হারিয়ে অনেক মহিলা ভিক্ষাবৃত্তি বা যৌনপেশায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

কাদের ফিস্টুলা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

সাধারণত কমবয়সী এবং দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ফিস্টুলা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়। ফিস্টুলার ঝুঁকি যাঁদের সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন:

- অল্পবয়সী মহিলা
- যেসব মহিলার দু'বার গর্ভধারণের মাঝে খুব কমসময়ের ব্যবধান থাকে
- যারা প্রথমবারের মতো সন্তান জন্ম দিচ্ছেন
- যেসব মহিলার শারীরিক বৃদ্ধি অপুষ্টি বা শৈশবকালীন কোনো অসুস্থতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আছে
- যারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন
- যারা যথাযথ প্রসবকালীন সেবা গ্রহণ না-করে বাড়িতে সন্তানের জন্ম দেন

এছাড়াও, যেকোনো বয়সের মহিলার কোনো একটি সন্তান জন্মদানের সময় প্রসব বাধাগ্রস্ত বা দীর্ঘায়িত হলে এবং প্রসূতি তাৎক্ষণিকভাবে যথোপযুক্ত চিকিৎসাসেবা না-পেলে ফিস্টুলা হতে পারে।

ফিস্টুলার চিকিৎসা

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুনর্গঠন: অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ফিস্টুলাবিশিষ্ট স্থানটির পুনর্গঠন সম্ভব, কিন্তু সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এসব ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর রোগীর উপযুক্ত সেবাযত্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা মানসম্মত চিকিৎসা-সরঞ্জামের সাহায্যে অস্ত্রোপচারে অপেক্ষাকৃত কম জটিল ফিস্টুলার ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ ভাগ সাফল্য লাভ করা যায় এবং বেশি জটিল ফিস্টুলার ক্ষেত্রে সাফল্যের হার শতকরা ৬০ ভাগ হয়ে থাকে। অস্ত্রোপচার সফল হলে মহিলারা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন এবং পুনরায় সন্তান গ্রহণ করতে পারেন। তবে, সেক্ষেত্রে যেন ফিস্টুলার পুনরাবৃত্তি না-ঘটে সেজন্য সিজারিয়ান অপারেশনের সাহায্যে শিশুর জন্ম দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিছু মহিলার অবস্থা অস্ত্রোপচারের অনুকূলে থাকে না—তাঁদের জন্য ইউরোস্টমি-নামক একটি চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। এ-ব্যবস্থায় রোগী প্রতিদিন একটি ব্যাগ পরিধান করেন। যাহোক, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ মহিলা তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন এবং পরিবার ও সমাজের লোকজনের সাথে সহজভাবে চলাফেরা করতে পারেন।

ক্যাথেটার ব্যবহার: ফিস্টুলা খুব প্রাথমিক অবস্থায় চিহ্নিত করা গেলে ক্যাথেটার ব্যবহার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে ফলি ক্যাথেটার ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ এতে একটি বেলুনের সাহায্যে একে জায়গামতো ধরে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলি ক্যাথেটার মূত্রথলি থেকে প্রস্রাব বয়ে নিয়ে তা সঠিক পথে বের করে দেয়। এই পদ্ধতিতে মূত্রথলির দেওয়ালের প্রসারণের সুযোগ থাকে, যার ফলে প্রসারিত মূত্রথলি ফিস্টুলার ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তগুলোকে একসাথে এনে জোড়া লাগার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ছোট আকারের ফিস্টুলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

কিছুকিছু ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত বা দীর্ঘায়িত প্রসবের ফলে ফিস্টুলার পাশাপাশি পায়ে পরিবাহিত স্নায়ুর ক্ষতি হওয়ার কারণে রোগীর হাঁটতে অসুবিধা হয়। এসব ক্ষেত্রে ফিস্টুলার চিকিৎসার পর রোগীকে ফিজিওথেরাপি দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

ফিস্টুলার চিকিৎসার মূল প্রতিবন্ধকতাসমূহ

জ্ঞান ও তথ্যের অপ্রতুলতা কোনো মহিলার ফিস্টুলার চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়

হিসেবে কাজ করে। ফিস্টুলার যে বেশ ভালো চিকিৎসা-ব্যবস্থা রয়েছে তা বেশিরভাগ মহিলাই জানেন না। আবার অনেকসময় জানা থাকা সত্ত্বেও অনেক মহিলা লজ্জায় বা ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রেখে যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা ফিস্টুলার চিকিৎসাকে আরো জটিল করে তোলে। এছাড়াও, অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক ও উন্নত চিকিৎসা-ব্যবস্থার অভাব এবং চিকিৎসা-ব্যয়ের দিকগুলোও ছোট করে দেখার মতো নয়। যেসব দরিদ্র দেশে ফিস্টুলার হার অনেক বেশি সাধারণত সেসব দেশে ফিস্টুলার চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচার করার মতো সুব্যবস্থা এবং সম্যক কারিগরি দক্ষতা ততটা সহজপ্রাপ্য নয়। তাছাড়া, অনেক মহিলার পক্ষেই এধরনের চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কীভাবে ফিস্টুলা প্রতিরোধ করা যায়

গর্ভাবস্থায় মায়ের পর্যাপ্ত সেবাযত্ন, সন্তান প্রসবের সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন, একাধিকবার সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিরতি সম্পর্কে জ্ঞান, নারীশিক্ষার উন্নয়ন এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ফিস্টুলা প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি। ফিস্টুলার সাথে সম্পর্কযুক্ত শারীরিক এবং সামাজিক বিষয়গুলো সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে জানাতে হবে। ফিস্টুলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির একটি অন্যতম পন্থা হলো মহিলাদেরকে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা এবং গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় সঠিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দান করা এবং তা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

বাধাগ্রস্ত ও দীর্ঘায়িত প্রসব এবং ফিস্টুলার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য প্রত্যেক মহিলার জীবনের শুরুতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যেমন মহিলাদের মানসম্মত পুষ্টি এবং পুষ্টি-সংক্রান্ত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি মেয়ে-শিশুর পুষ্টির চাহিদা ঠিকমতো পূরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব এবং বাধাগ্রস্ত প্রসবের সম্ভাবনা দেখা দিলে সিজারিয়ান অপারেশনের সুফল সম্পর্কে প্রত্যেক মহিলা ও স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীকে সচেতন করে তোলা দরকার। দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি নিয়ে কাজ করে থাকে এমন সংস্থাগুলো ফিস্টুলা প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে ফিস্টুলা প্রতিরোধ একটি প্রধান ধাপ। ■

শব্দদূষণ: একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্যসমস্যা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
আইসিডিডিআর,বি

ঢাকাসহ সারাদেশে শব্দদূষণ একটি অতি গুরুতর পরিবেশগত স্বাস্থ্যসমস্যা। বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের হিসাবমতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে শব্দদূষণের মাত্রা ৮৬ ডেসিবেল থেকে ১১০ ডেসিবেল পর্যন্ত (ডেসিবেল হলো শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক)। সাহিক, সুন্দর জীবন, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনসহ আরো অনেক সংগঠনের সমীক্ষা প্রতিবেদনেও তাই বলা হয়েছে। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত শব্দের মাত্রা হচ্ছে রাত ও দিনে ৪০-৫০ ডেসিবেলের মধ্যে। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনেও এলাকাভেদে দিনে ও রাতে শব্দের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী নীরব এলাকায় দিনে ৪৫ ডেসিবেল ও রাতে ৩৫ ডেসিবেল, আবাসিক এলাকায় দিনে ৫০ ডেসিবেল ও রাতে ৪০ ডেসিবেল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ডেসিবেল ও রাতে ৫০ ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ডেসিবেল ও রাতে ৬০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ডেসিবেল ও রাতে ৭০ ডেসিবেল শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাস্তায় গাড়ির হর্নের বিকট শব্দে অতিষ্ঠ এক স্কুলগামী শিশু

শব্দদূষণের ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য পরিবেশভিত্তিক সংগঠনসমূহের দাবির মুখে বাংলাদেশ সরকার ২০০৬ সালে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই আইনের কোনো বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। শুরুতে, অর্থাৎ ২০০৭ সালের প্রথমদিকে, তৎকালীন শেরাটন হোটেল থেকে ক্যান্টনমেন্টের শহীদ জাহাঙ্গীর গেট পর্যন্ত আমরা এই আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভবত মাত্র এক মাসের মাথায় কর্তৃপক্ষ আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাহীন শিথিলতা প্রকাশ করে এবং অবস্থা সেই আগের মতোই হয়ে যায়।

ঢাকার রাস্তায় মোটরযানের সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং প্রতিনিয়ত তা বেড়েই চলেছে। সেই হিসেবে শব্দদূষণের মাত্রাও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া, ঢাকা শহরে এমন কোনো আবাসিক এলাকা নেই যেখানে নির্মাণকাজ চলছে না। শব্দদূষণ আইনে আছে, আবাসিক এলাকার ৫০০ গজের মধ্যে ইট-ভাঙার মেশিনসহ শব্দদূষণ সৃষ্টিকারী কোনো ধরনের কাজ করা যাবে না, এমনকি দিনের বেলায়ও না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই ঢাকা শহরে নির্মাণকাজ চলতে থাকে। রাতের বেলায় ট্রাকগুলো বিকট শব্দে হাইড্রলিক হর্ন বাজিয়ে আবাসিক এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। এমনভাবে ইট, রড এবং নির্মাণ কাজের জন্য

প্রয়োজনীয় বিশাল বিশাল লোহার পাত এবং অন্যান্য ভারী জিনিস ট্রাক থেকে নিচে ফেলা হয় যে আশপাশের মানুষের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এছাড়া টাইলস ও অ্যালুমিনিয়াম কাটা এবং ড্রিলিং-এর শব্দে মানুষের বধির হওয়ার মতো অবস্থা হচ্ছে। ঢাকা ছাড়াও সারাদেশে

আবাসিক এলাকায় শব্দদূষণের একটি বড় কারণ নির্মাণ কাজ

অসংখ্য কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান আশপাশের আবাসিক এলাকা ও জনস্বাস্থ্যের তোয়াক্কা না-করে উচ্চমাত্রার শব্দ সৃষ্টি করে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সর্বত্র একশ্রেণীর হকার রিক্সা বা রিক্সাভ্যানে মাইক লাগিয়ে নিজ নিজ পণ্য বিক্রির প্রচার চালাচ্ছে। এসব অসহনীয় শব্দদূষণের ফলে মানুষের শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়ার সাথেসাথে হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, রাতের শব্দে মানুষ ঠিকমতো ঘুমাতে না-পেরে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে ঝিমুচ্ছে এবং কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীরা মনোযোগ দিয়ে তাদের পড়াশুনা করতে পারছে না এবং এর প্রভাব পড়ছে তাদের পরীক্ষায় এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে। গর্ভবতী মা ও ছোট শিশুদের ওপর এর প্রভাব আরো মারাত্মক। উল্লেখ্য, ক্রমাগত শব্দদূষণের ফলে মানুষের শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া ছাড়াও, রক্তচাপ বেড়ে যায়, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, হজমক্রিয়া ব্যাহত হয়, মাংসপেশিতে খিঁচুনি হয়, শিশুদের বেড়ে-ওঠা বাধাগ্রস্ত হয় এবং গর্ভবতী মহিলাদের মৃত সন্তান প্রসব করার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। এসমস্ত সমস্যায় কত মানুষ আক্রান্ত এবং তাদের চিকিৎসায় কত টাকা খরচ হচ্ছে তার সঠিক হিসাব কারো কাছে নেই। গবেষকগণ এর ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন।

শব্দদূষণের এই ভয়াবহতা রোধকল্পে সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র শব্দদূষণ আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আবাসিক এলাকায় ইট-ভাঙার মেশিনের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা; রাতের বেলায় আবাসিক এলাকায় নির্মাণ কাজসহ শব্দ সৃষ্টিকারী যেকোনো ধরনের কাজ বন্ধ করা; বাস-ট্রাক প্রবেশ, হর্ন বাজানো এবং শব্দদূষণ সৃষ্টি করে মালামাল ওঠানো-নামানো নিষিদ্ধ করা; বড় রাস্তার পাশে প্রয়োজনীয় মালপত্র নামিয়ে সেখান থেকে দিনের বেলায় ঠেলাগাড়ি দিয়ে আবাসিক এলাকায় নেওয়ার ব্যবস্থা করা; রাজধানীর রিক্সামুক্ত রাস্তাগুলোতে গাড়ির হর্ন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা; সব ধরনের যানবাহনেই হাইড্রলিক হর্ন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা; সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সব প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত ড্রাইভারের প্রতি সুস্পষ্ট কারণব্যতীত গাড়ির হর্ন না-বাজানোর সরকারি নির্দেশ জারি ও তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; হর্ন না-বাজিয়ে গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ড্রাইভিং স্কুলগুলোর প্রতি কঠোর নির্দেশ জারি করা; ভ্যানগাড়িতে মাইক দ্বারা প্রচার চালিয়ে পণ্য এবং লটারির টিকিট বিক্রি বন্ধ করা; সরকারি-বেসরকারি সব রেডিও এবং টেলিভিশনে শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিকসমূহ নিয়মিত প্রচার নিশ্চিত করা; এবং সরকারি উদ্যোগে 'হর্নবিহীন দিবস' বা ইংরেজিতে 'নো হংকিং ডে' হিসেবে একটি দিন পালন করা।

ব্যক্তিক বা সামাজিক পর্যায়ে আমরা যা করতে পারি তা হলো, আমরা নিজেরা এই দূষণ সৃষ্টি না-করার বিষয়ে সচেষ্ট হতে পারি এবং অন্য কেউ দূষণ সৃষ্টি করলে তাকে এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ দিতে পারি। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে? না, নির্মাণ কাজ অবশ্যই চলবে, তবে সেটি হিসেব করে করতে হবে, যেমন ইট-ভাঙার মেশিন দিয়ে ইট না-ভেঙে শ্রমিকদেরকে দিয়ে হাতে কাজটি করানো যেতে পারে। ইট-ভাঙার মেশিন যখন ছিলো না তখন তো এভাবেই করা হতো। আর একান্তই যদি ইট-ভাঙার মেশিন ব্যবহার করতে হয়, তাহলে মেশিনটি একটি দেওয়ালঘেরা ঘরের মধ্যে রেখে ব্যবহার করা যেতে পারে বা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে ইট ভেঙে আনা যেতে পারে, তবে তা কোনো অবস্থাতেই যেন ভোর সাতটার আগে এবং সন্ধ্যা সাতটার পরে না হয়। তেমনিভাবে ট্রাকগুলো আবাসিক এলাকায় হর্ন না-বাজিয়ে একটু আস্তে আস্তে চলাফেরা করতে পারে এবং মালামালগুলো আস্তে করে নামাতে পারে। তবে, সেটা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে, কাজেই ট্রাকের জন্য আবাসিক এলাকার ছোট রাস্তায় ঢোকার অনুমতি না-দেওয়াই ভালো। রাতের বেলায় বড় রাস্তার পাশে মালপত্র নামিয়ে রেখে দিনের বেলায় ঠেলাগাড়ি বা অন্য কোনো বাহনে করে সেগুলো জায়গামতো নেওয়া উচিত। রাস্তায় গাড়ির হর্ন বাজানোর প্রয়োজন হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে চালককে সীমিতভাবে তা বাজাতে হবে এবং কোনোভাবেই হাইড্রলিক হর্ন থাকতে পারবে না। ভ্যানগাড়িতে বা রিক্সায় বিশেষ প্রয়োজনে সাবধানতার সাথে মাইক ব্যবহার করা যেতে পারে। তেমনিভাবে অন্য যেসব স্থানে মাইকের প্রয়োজন সেসব স্থানে অবশ্যই মাইকের ব্যবহার হবে, তবে তা যেন কোনোভাবেই আবাসিক এলাকা বা লোকালয়ের মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে না-দাঁড়ায়। আমাদের অনেকের বাসাবাড়িতে, এমনকি গ্রামেও আমাদের সন্তানরা অনেকে উচ্চশব্দে গান-বাজনা শোনে। এটিও শব্দদূষণের অন্যতম একটি কারণ। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তাদের এই আনন্দ অন্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এমনিভাবে আমাদের সবাইকে শব্দদূষণের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। একা না-পারলে সমমনা লোকজনকে নিয়ে জোটবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে, জোর প্রচারণা চালাতে হবে। প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। তবুও নবপ্রজন্মকে এই দূষণের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে। আমরা সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে বধির হয়ে বেড়ে উঠতে দিতে পারি না। ■

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

এ.এইচ.এম. মফিজউদ্দীন
আইসিডিডিআর,বি

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ আমাদের সবার অতি পরিচিত। শরীরে ইনসুলিন-নামক অতি জরুরী একটি হরমোন যথেষ্টভাবে উৎপন্ন না-হলে বা তা উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও শরীরের কোষগুলো এই ইনসুলিন-এর প্রতি সংবেদনশীল না-হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে ডায়াবেটিস বলা হয়ে থাকে। এ-রোগ ছোঁয়াচে নয়, তবে এটি একটি ক্রনিক রোগ, যা মূলত বংশগতভাবে বিস্তার লাভ করে এবং অনেক পরিবারেই বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে এ-রোগ দেখা যায়।

দিনদিন ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব বেড়েই চলেছে। ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশন-এর মতে ২০১০ সালে বিশ্বে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা ছিলো প্রায় ২৮ কোটি ৫০ লাখ, যা পূর্ণবয়স্ক জনগোষ্ঠির শতকরা ৬.৭%। ২০৩০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ৪৩ কোটি ৮০ লাখে গিয়ে ঠেকতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, বিশ্বে ডায়াবেটিক রোগীর প্রায় ৭০% নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোর জনগণ। বাংলাদেশেও ডায়াবেটিস-সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে।

ডায়াবেটিস বিভিন্ন জটিল রোগের অগ্রদূত। এর সবচেয়ে খারাপ দিকটি হলো এ-রোগ কখনো সারে না, বরং শরীরে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ-কথা সত্যি যে, কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিকমতো মেনে চললে একজন ডায়াবেটিক রোগী ভালো থাকতে পারেন এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারেন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রেখে সুস্থ থাকার উপায়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

১. ডায়াবেটিক রোগীর জন্য উপযোগী খাবার খাবেন। চিনিযুক্ত খাবার পরিহার করুন। ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য খাদ্যতালিকা নির্ধারণ করে থাকেন এমন একজন ডায়েটিশিয়ান-এর কাছে এ-বিষয়ে পরামর্শ নিতে পারেন। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য ২৪ ঘণ্টায় ক্যালরি গ্রহণের আদর্শ পরিমাণ নিম্নরূপ:

- হালকা ধরনের কাজ করেন এমন ব্যক্তির জন্য ২৫ কিলোক্যালরি/কেজি
- মাঝারি ধরনের কাজ করেন এমন ব্যক্তির জন্য ৩০ কিলোক্যালরি/কেজি
- ভারী কাজ করেন এমন ব্যক্তির জন্য ৩৫ কিলোক্যালরি/কেজি।

ক্যালরির এই পরিমাণ স্বাভাবিক ওজনের প্রাপ্তবয়স্কদের (BMI ১৮ থেকে ২৫) জন্য প্রযোজ্য। BMI ১৮-র কম হলে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং ২৫-এর বেশি হলে কমাতে হবে। ডায়াবেটিক রোগীর খাবারে আনুপাতিকভাবে ৫০-৬০% শর্করা (কার্বোহাইড্রেট), ১৫-২০% আমিষ (প্রোটিন) এবং ৩০-৩৫% চর্বিজাতীয় (ফ্যাট) উপাদান থাকা উচিত। ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত বারডেম হাসপাতালে বহুল-ব্যবহৃত ডায়াবেটিস বইয়ের ২৭-৩৬ পৃষ্ঠায় একজন ডায়াবেটিক রোগীর জন্য উপযোগী খাবারের বর্ণনা দেওয়া আছে।

২. প্রতিদিন পাঁচবার খাবার খাবেন—সকালের নাস্তা, দিনের মাঝামাঝি সময়ে হালকা নাস্তা, দুপুরের খাবার, বিকেলে হালকা নাস্তা এবং রাতের খাবার।

৩. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করুন।

৪. ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা পরিহার করুন।

৫. দৈনিক ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন:

- সাঁতার কাটা, যোগব্যায়াম বা সাইকেল চালানোর মতো হালকা ব্যায়াম করুন।
- প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৩০ মিনিট দ্রুত হাঁটুন।
- এমনভাবে যোগব্যায়াম করতে চেষ্টা করুন যেন ঘাম ঝরে। এরপর কিছু সময় বিশ্রাম নিন। যোগব্যায়ামের সাহায্যে আপনার শরীর ও মনের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চেষ্টা করুন।
- আশপাশের কোনো ব্যায়ামাগার, কোনো সংঘ বা ক্রীড়াচক্রের সাথে জড়িত হতে চেষ্টা করুন। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলায় অংশগ্রহণ করুন।

নিয়মিত খেলাধুলা ডায়াবেটিস প্রতিরোধে অত্যন্ত সহায়ক

সৌজন্যে: সিসিসিডি

গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ

HbA1c-র আদর্শ মাত্রা ৬.৫% ধরা হয়ে থাকে। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে HbA1c পরীক্ষাটি করান এবং তাঁর কাছ থেকে আপনার জন্য প্রযোজ্য লক্ষ্যমাত্রা জেনে নিন। HbA1c যেন নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করতে না-পারে সেভাবে চলতে চেষ্টা করুন। যথার্থ খাদ্য গ্রহণ অথবা একটি ওষুধ সেবনের মাধ্যমে HbA1c আয়ত্তে রাখতে পারলে খুবই ভালো। ছয়মাস পরপর HbA1c পরীক্ষা করুন।

উচ্চ রক্তচাপ

যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস বা কিডনির রোগ নেই তাঁরা বছরে অন্তত একবার রক্তচাপ মাপুন। যাঁরা উচ্চ রক্তচাপের জন্য ওষুধ সেবন করছেন বা কিডনির রোগে ভুগছেন তাঁরা প্রতি ৪-৬ মাস পরপর রক্তচাপ পরীক্ষা করাতে ভুলবেন না। একজন ডায়াবেটিক রোগীর স্বাভাবিক রক্তচাপ ১৩০/৮০ mmHg ধরা যেতে পারে।

রক্তে লিপিড

ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে লিপিড-এর আদর্শ মাত্রা (কোলেস্টেরল <৩.৮৮ mmol/L; ট্রাইগ্লিসারাইড <১.৭ mmol/L) বজায় রাখতে প্রতিবছর অন্তত একবার খালিপেটে লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষাটি করুন।

ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা

পায়ের যত্ন নিন—প্রতিবছর অন্তত একবার অভিজ্ঞ

চিকিৎসকের দ্বারা পা পরীক্ষা করুন। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন এবং পায়ের যত্ন নিন।

চোখ পরীক্ষা করুন—ডায়াবেটিস রোগীদের বছরে অন্তত একবার চোখ পরীক্ষা করানো উচিত। চোখে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আরো ঘনঘন চোখ পরীক্ষা করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কিডনি পরীক্ষা করুন—প্রস্রাবে মাইক্রো অ্যালবুমিন আছে কি না তা পরীক্ষা করুন। নিয়মিতভাবে সিরাম ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষার মাধ্যমে কিডনির কার্যকারিতা পরিমাপ করুন।

স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করুন—স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে নিয়মিত স্বল্পমাত্রার অ্যাসপিরিন সেবন করুন।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসে ইনসুলিন গ্রহণ

একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে ডায়াবেটিসের মাত্রা অনুযায়ী আপনার জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিনের ডোজ নির্ধারণ করিয়ে নিন। হাইপার ও হাইপোগ্লাইসেমিয়া-র মতো জরুরী অবস্থায় রোগী নিজে তাঁর ইনসুলিনের ডোজ কিছুটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন এবং পরে অবস্থার উন্নতি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণত খালিপেটে গ্লুকোজের মাত্রা ১৪ mmol/L বা তার বেশি থাকলে এবং HbA1c-র মাত্রা ৭% বা তার বেশি থাকলে রোগীকে ইনসুলিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস দেখা দিলে বা ডায়াবেটিস রোগীর শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হলে সাধারণত ইনসুলিনের সাহায্যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা হয়ে থাকে।

রোগীর রক্তে গ্লুকোজ-এর আদর্শ মাত্রা

রোগীর দেহে গ্লুকোজের মাত্রা খাওয়ার আগে ৪-৬ mmol/L এবং খাওয়ার পরে <১০ mmol/L থাকা উচিত।

গ্লুকোমিটারের সাহায্যে ঘরে বসেই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাপ করা যায়

টিকা

সময়মত ফ্লু, নিউমোনিয়া এবং অন্যান্য রোগের টিকা গ্রহণ করে এসব রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করুন।

ডায়াবেটিসপ্রসূত রোগ এবং জটিলতা

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস যেসব রোগের পথকে সুগম করে তোলে এবং সমস্যা সৃষ্টি করে, সেগুলো হলো স্ট্রোক, পায়ের গ্যাংগ্রিন, হৃদরোগ, চোখের ছানি, মূত্রনালীর বারবার সংক্রমণ, ফোঁড়া, মাড়ির প্রদাহ, কিডনির নিষ্ক্রিয়তা, শারীরিক অক্ষমতা, যক্ষ্মা, ডায়রিয়ার প্রবণতা, গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের পরে বা আগে সন্তান প্রসব অথবা মৃতসন্তান প্রসবের সম্ভাবনা, ইত্যাদি। একজন ডায়াবেটিক রোগীর এসব বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।

হাইপার এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণসমূহ

শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে বা কমে গেলে তাকে যথাক্রমে হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়ে থাকে। একজন ডায়াবেটিক রোগী যেকোনো সময় হাইপার বা হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন; এই দু'টি অবস্থাই রোগীর জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। কাজেই, এর বিভিন্ন লক্ষণ, যেমন শরীর খুব কাঁপতে শুরু-করা, অতিরিক্ত ঘাম-হওয়া, তীব্র ক্লান্তি অনুভব-করা, শরীরে ব্যথা অনুভব-করা, খিঁচুনি-হওয়া, দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে-ওঠা, বিভ্রান্ত বোধ-করা, মাথা-ঘোরা, বুক ধড়ফড়-করা প্রভৃতি সম্পর্কে রোগীকে সচেতন থাকতে হবে। হাইপারগ্লাইসেমিয়ার চেয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে রোগীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই, এসব ক্ষেত্রে রোগীর উচিত দ্রুত সামান্য একটু চিনি বা যেকোনো মিষ্টি খাবার খাওয়া, যাতে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে থাকলে তা দ্রুত কাটিয়ে ওঠা যায়। পরে একটু সুস্থ বোধ করলে গ্লুকোজ পরিমাপ করে যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত।

মনে রাখতে হবে, ডায়াবেটিস নিরাময়যোগ্য নয়, তবে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে এ-রোগকে জয় করা কোনো ব্যাপারই না। ডায়াবেটিস রোগকে রাস্তার সিগনাল বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। সিগনাল বাতি যেমন রাস্তার যানবাহনের চলাচলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে, আমাদের জীবনেও তেমনি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ডায়াবেটিস রোগকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারি। ■

একজন ডায়াবেটিক রোগী ইনসুলিন গ্রহণ করছেন

বাংলাদেশে নিপাহ রোগ ও প্রতিরোধের উপায়

রেবেকা সুলতানা এবং নাজমুন নাহার
আইসিডিডিআর,বি

বিগত প্রায় ১০ বছর ধরে বাংলাদেশে শীতকালে নিপাহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। নিপাহ ভাইরাস এনসেফালাইটিস (encephalitis) নামের জ্বরজাতীয় একটি রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগে মস্তিস্কে তীব্র প্রদাহ হয়। বাংলাদেশে এপর্যন্ত নিপাহ এনসেফালাইটিস রোগে আক্রান্ত শতকরা ৭২% জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হওয়ার পর যারা বেঁচে থাকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। এ-রোগে আক্রান্ত হলে জ্বরের পাশাপাশি মাথাব্যথা, খিঁচুনি, শরীরে ব্যথা, বমি, প্রলাপ-বকা, মানুষকে চিনতে না-পারা এবং অজ্ঞান হয়ে-যাওয়াসহ আরো নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

মানুষ কীভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়

বাংলাদেশে একটি বিশেষ ধরনের বাদুড়ের শরীরে নিপাহ ভাইরাস পাওয়া গেছে। এই বাদুড়ের লালা ও মলমূত্রের মাধ্যমে এই ভাইরাসটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে আক্রান্ত করে। বাংলাদেশে সাধারণত শীতকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা যায়। শীতকালে কাঁচা খেজুরের রস খেতে প্রায় সবাই ভালোবাসে। আমাদের দেশে গাছিরা শীতকালে সাধারণত বিকেল বেলায় খেজুর গাছে হাঁড়ি লাগায় এবং সারারাত ধরে হাঁড়িতে রস জমা হয়। ভোরবেলায় গাছিরা এই রস সংগ্রহ করে থাকে।

রাতের বেলা বাদুড় খেজুরের রস চেটে খায় এবং কখনো কখনো হাঁড়িতেই মলমূত্র ত্যাগ করে। বাদুড়ের লালা বা মলমূত্রের মাধ্যমে নিপাহ ভাইরাস খেজুরের রসে মিশে যায়। নিপাহ ভাইরাস আছে এমন রস মানুষ পান করলে এই ভাইরাস মানুষকে

রাতের বেলায় বাদুড় খেজুরের রস খেতে আসে

এই রোগে আক্রান্ত করতে পারে। নিপাহ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নিবিড় সংস্পর্শে আসলে অন্যদের মধ্যে এ-রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে।

এই রোগ প্রতিরোধের উপায়

যেহেতু নিপাহ ভাইরাস আছে এমন কাঁচা খেজুরের রস পান করার ফলে এই রোগটি ছড়ায়, তাই রোগ প্রতিরোধের একটি উপায় হতে পারে কাঁচা খেজুরের রস পান করা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু এর ফলে মানুষ অতি সুস্বাদু একটি প্রাকৃতিক নির্যাস থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই, খেজুরের রস পান করতে হলে অত্যন্ত সহজ উপায়ে খেজুর গাছের হাঁড়ি ও রসের প্রবাহকে ঢেকে রসকে ভাইরাসমুক্ত রাখা যায়। হাঁড়ি ও রসের প্রবাহকে আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত বস্তুটি আমাদের গ্রামাঞ্চলে বানা নামে পরিচিত। খেজুর গাছে বানা ব্যবহারের ফলে বাদুড় আর রসের সংস্পর্শে আসতে পারে না, ফলে লালা বা মলমূত্র ছড়াতে পারে না। বাঁশ, পাটকাঠি, ধইঞ্চার কাঠি বা পলিথিন দিয়ে এই বানা তৈরি করা যেতে পারে। এসব জিনিস গ্রামগঞ্জে খুবই সহজলভ্য এবং অল্প দামে পাওয়া যায়। আমরা যারা রস খেতে চাই এবং সুস্থ থাকতে চাই তাদের সবার উচিত বানার ব্যবহার ছাড়া সংগৃহীত কাঁচা রস না-খাওয়া। রস খাওয়ার আগে যে গাছ থেকে তা সংগৃহীত হয়েছে তাতে বানা লাগানো ছিলো কি না তা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। মানুষকে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানাতে হবে। গাছিদের পাশাপাশি গাছমালিকেরাও যেন বানা তৈরি

বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে বানা তৈরি করা হচ্ছে

পাটকাঠির বানা

খেজুর গাছে লাগানো বাঁশের বানা

পলিথিনের বানা

করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গাছি ভাইদেরকে বানা ব্যবহার করে রস সংগ্রহ করার উপায়টির গুরুত্ব বোঝাতে হবে। এতে বাজারে প্রাপ্ত খেজুরের রসও নিরাপদ ও জীবাণুমুক্ত রাখা সম্ভবপর হবে। আমাদের সবার সচেতনতার মাধ্যমে খুব সহজে নিপাহর মতো একটি ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধ করে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু এড়ানো সম্ভব। ■

কম খেলে ভালো থাকা যায়

এম. করিম খান
কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ

আমরা সবাই সুস্থ, নিরোগ এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হতে চাই। চাই বেশিদিন সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে আর বয়সটাকে ধরে রাখতে। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? উপায়টি বলার আগে জেনে নেই রোগ-বালাই বা শরীর ক্ষয়ের কারণগুলো। শরীর ক্ষয়ের বিভিন্ন কারণের মধ্যে ফ্রি র‍্যাডিকেল অন্যতম। ফ্রি র‍্যাডিকেলের কথা কম-বেশি হয়তো আমরা সবাই শুনেছি। ফ্রি র‍্যাডিকেল হচ্ছে এমন জৈবিক অণু, যার মধ্যে unpaired ইলেকট্রন বা বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন থাকে। এরা কোষ ভেঙে তৈরি হয়, আবার এরাই অন্য কোষকে ধ্বংস করে। যে যত বেশি খাবে তার শরীরে রাসায়নিক বিক্রিয়া তত বেশি হবে এবং ফ্রি র‍্যাডিকেল তৈরি হবে। এই ফ্রি র‍্যাডিকেল তখন অন্যান্য কোষগুলোকে ধ্বংস করতে শুরু করবে। কমে যাবে আয়ু, হবে নানা অসুখ-বিসুখ আর বাড়বে বয়সটাও। নানা ধরনের ফ্রি রেডিকেল আছে; তার মধ্যে সুপার অক্সাইড, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, হাইড্রোক্সিল র‍্যাডিকেল প্রভৃতি অন্যতম। ফ্রি র‍্যাডিকেলের এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের হতে হবে স্বল্পাহারী। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাওয়া যাবে না, জিহ্বাকে সংযত করতে হবে। ভালো খাবার বা নিমন্ত্রণ পেলেই বেশি খাওয়া যাবে না।

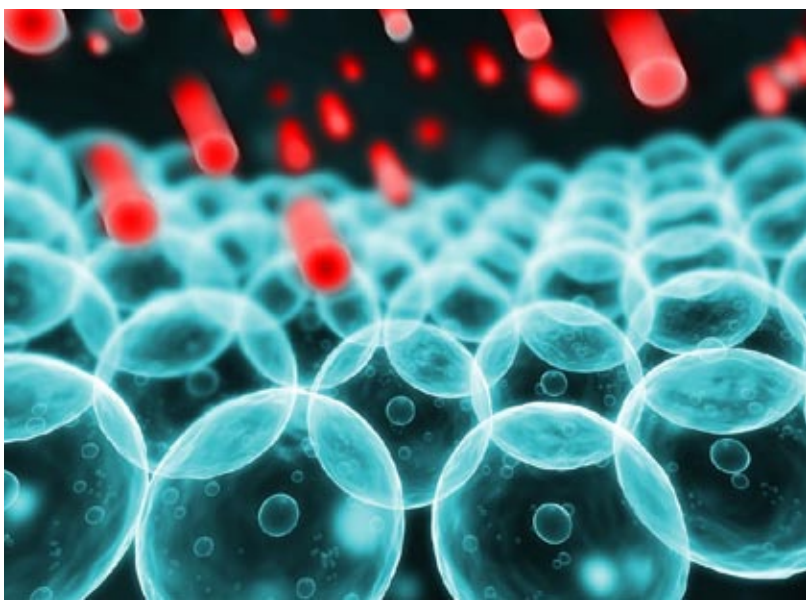

খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো, "তোমরা যে পরিমাণ খেতে পারো তার তিনভাগের একভাগ খাবে, একভাগের সমান পানি পান করবে এবং পেটের বাকি একভাগ খালি রাখবে।" অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত এই উপদেশের কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম মানুষই তা মেনে চলি। চলুন, আমরা সবাই নিজ স্বার্থে স্বল্পাহারী হয়ে যাই এবং নিজেকে ভালো রাখতে চেষ্টা করি। সেইসাথে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট-সমৃদ্ধ রঙিন শাকসব্জি এবং ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস করি, যা ফ্রি র‍্যাডিকেলের বিরূপ প্রভাবকে প্রতিহত করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।